প্রাচীন সাহিত্যে পরিবেশ-ভাবনা ও বর্তমান সময়ের প্রাসঙ্গিকতা

চন্দনা রাণী বিশ্বাস*

সারসংক্ষেপ

বর্তমান বিশ্বে পরিবেশ বিপন্ন ও বিধ্বস্ত হয়ে উঠেছে মানুষের অতিমাত্রার প্রয়োজন, সীমাহীন লোভ, অজ্ঞতা আর অপরিণামদর্শিতার কারণে। এ কথা সত্য যে, পরিবেশই মানুষকে রক্ষা করে। কিন্তু অনেকেই পরিবেশের এই উপযোগিতাকে মূল্যায়ন করে না। পরিবেশের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ে তারা স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে। যার ফলে প্রভাবশালী অনেক দেশ আত্মকেন্দ্রিক চিন্তাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে ভুলে যায় পরিবেশের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ। তারা পরিবেশ-বিধ্বংসী পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়। ফলে বিশ্বের প্রাকৃতিক পরিবেশ হয়ে উঠেছে ভারসাম্যহীন। জলবায়ুও ক্রমাগত হয়ে উঠছে রুগ্ন, খেয়ালি ও বৈরী এবং রুদ্র-রুক্ষ-প্রলয়ংকরী। মানুষসহ সমগ্র প্রাণিজগতে এর ভয়ঙ্কর প্রভাব চরম আকারে লক্ষণীয়। মানুষ শারীরিক ও মানসিকভাবে নানারকম অস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করছে। মানুষের তৈরি এই অসুস্থ ও দূষিত পরিবেশকে কীভাবে সুস্থ করা যায়, তা নিয়ে সচেতন মানুষের ভাবনার অন্ত নেই। সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতবর্ষের সচেতন পরিবেশবাদীরা পরিবেশকে কোন দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং পরিবেশকে সুস্থ রাখার জন্য তাঁদের চিন্তা-চেতনা কেমন ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যে। প্রাচীন ভারতে প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি সকল মানুষের একটা সযত্ন স্নেহার্দ্র হৃদয় ছিল। কোনোভাবেই তাঁরা প্রকৃতির প্রতি স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যকে এখানে প্রাচীন সাহিত্য বলা হয়েছে। এই প্রাচীন সাহিত্যে উল্লেখিত প্রাচীন ভারতের পরিবেশবাদীদের পরিবেশভাবনা এবং বর্তমান বিশ্বে তাদের এই ভাবনাগুলি কতটা প্রাসঙ্গিক ও সবার জন্য উপযোগী– তা বর্তমান প্রবন্ধে তুলে ধরার সযত্ন প্রয়াস চালানো হয়েছে।

মানব ও প্রাণিকুল, এই পৃথিবীর বৃক্ষরাজি, লতা-পাতা, পাহাড়, নদী-সাগরের স্রোতধারা, আগুন-জল-মাটি, আকাশ-বাতাসের সম্পর্ক কিংবা আকাশভরা সূর্যতারা নিয়ে বৈদিক ঋষিকবির অন্তহীন কৌতূহল ছিল। সহৃদয় চিত্তে তাঁরা এ পৃথিবীর প্রকৃতির মাঝে প্রাণের সত্তা খুঁজে পেয়েছেন। অসীম আকাশের তারায় তারায়, নদী-সাগরের স্রোতধারায়, বসুন্ধরার প্রতি ধূলিকণায় ঋষিকবি প্রাণের পরশ অনুভব করেছেন। তাই এই প্রকৃতিতে তাঁরা কখনও মানবী, কখনও বা দেবীসত্তাকে খুঁজে ফিরেছেন। অথর্বসংহিতার পৃথিবীসূক্তে (১২/১) ৬৩টি কবিতায় (সেকালে যা মন্ত্র নামে অভিহিত) ঋষিকবি অপরূপভাবে পৃথিবীর রূপের বর্ণনা করেছেন। তুষারাবৃত পর্বতশ্রেণি, দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর, ধান-যব প্রভৃতি শস্যে পূর্ণ ভূমি, পাখির কল-কাকলি, গহীন অরণ্যানী, বৈচিত্র্যময় ছয় ঋতু, সজল জলদে আবৃত গগনতল, সরীসৃপসহ দ্বিপদ-চতুষ্পদ প্রাণিকুল– এ সব কিছু নিয়ে ঋষিকবি ভেবেছেন, এঁকেছেন পৃথিবীর রূপমাধুরী তাঁর মন্ত্ররূপ কবিতায় (পৃথিবীসূক্ত ১২/১-৬৩)। পৃথিবীর উদ্দেশে তিনি বলেছেন:

... মাতা ভূমিঃ পুত্রো অহং পৃথিব্যাঃ (১২/১/১২)। – মাতা আমার পৃথিবী আর আমি সন্তান তাঁর।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের চেতনায় এমন ভাবনার অভিব্যক্তি ঘটেছে– 'আমি তোমারই মাটির কন্যা, জননী বসুন্ধরা।'[১]

---

* সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মাতৃস্নেহ তুলনাবিহীন। সেই অকৃত্রিম, অতুলনীয় মাতৃস্নেহ দ্বারা পৃথিবী পালন করছে আমাদের।

"আমাদের মাতা অপেক্ষাও পৃথিবী অধিকতর মাতা। পৃথিবী আমাদের মাতৃসমা। মায়ের ঋণ তো শোধ হয় না, পৃথিবীর কাছে আমরা যে আরও ঋণী। পৃথিবীমাতার কোলেই আমাদের জন্ম। যত বড়ই হই না কেন এই মায়ের কোলের বাহিরে যাওয়ার উপায় নেই। পৃথিবীমাতার স্তন্যরস যে অন্ন, তাহাই আমাদের শেষদিন পর্যন্ত সাথী। পৃথিবীমাতার স্নেহের অন্ত নাই, ইহার ঋণ অপরিশোধনীয়।"[২]

পৃথিবী কল্যাণময়ী। কেননা আমাদের কল্যাণ পৃথিবীতেই নিহিত –

ভূমে মাতর্নি ধেহি মা ভদ্রয়া সুপ্রতিষ্ঠিতম্।
সংবিদানা দিবা কবে শ্রিয়াং মা ধেহি ভূত্যাম্ ॥ (অথর্ববেদ, ১২/১/৬৩)

পৃথিবী আমাদের জননী সুধাময়ী। সুধাময় জলধারা তাইতো তার দান।

শুদ্ধা ন আপস্তন্বে ক্ষরন্তু যো নঃ সেদুরপ্রিয়ে তং নি দধ্মঃ।
পবিত্রেণ পৃথিবি মোৎ পুনামি ॥ (অথর্ববেদ, ১২/১/৩০)

পৃথিবীর প্রাণসুধা রসধারায় আমরা বেঁচে আছি। পৃথিবী তাই জীবনদাত্রী। শুধু মানুষ নয়, বৃক্ষরাজি কিংবা সকল প্রাণিজগৎকে মাতা বসুন্ধরা তার স্নেহময় কোলে স্থান দিয়েছে। এ দিকে লক্ষ্য রেখেই মহাভারতের কবি ব্যাসদেব ভীষ্মের মাধ্যমে মাতা বসুন্ধরার গুণকীর্তন করেছেন এভাবে:

সুপ্রদর্শা বলবতী চিত্রা ধাতুবিভূষিতা ।
উপেতা সর্ব্বভূতৈশ্চ শ্রেষ্ঠা ভূমিরিহোচ্যতে ॥ (অনুশাসন পর্ব, ৪৭/২)
– সুদর্শনা শস্যশালিনী বিচিত্ররূপী গৈরিকবরণী।
সবার সেরা ভূমিমাতা সকল জীবের আশ্রয়ধারিণী ॥
ভূমৌ চ জায়তে সর্ব্বং ভূমৌ সর্ব্বং বিনশ্যতি।
ভূমিঃ প্রতিষ্ঠা ভূতানাং ভূমিরেব পরায়ণম্ ॥ (ভীষ্মপর্ব, ৪/২০)
– এ মাটিতেই জন্ম সবার, এ মাটিতেই ক্ষয়।
এ মাটিতেই জীবনধারণ, সর্বভূতের আশ্রয় ॥

পৃথিবীর কাছে তাই আমাদের প্রার্থনা – দাও সুন্দর প্রাণময় জীবন ও দীর্ঘ আয়ু:

ভূম্যাং দেবেভ্যো দদতি যজ্ঞং হব্যমরঙ্কৃতম্ ।
ভূম্যাং মনুষ্যা জীবন্তি স্বধয়ান্নেন মর্ত্যাঃ।
সা নো ভূমিঃ প্রাণমায়ুর্দধাতু জরদষ্টিং মা পৃথিবী কৃণোতু ॥ (অথর্ববেদ, ১২/১/২২)

ঋষিকবি এই প্রাণময় সুন্দর ভুবনে সতেজ দেহ নিয়ে একশ শরৎ বাঁচার আকাঙ্ক্ষা করেছেন:

পশ্যেম শরদঃ শতং, জীবেম শরদঃ শতং,
শৃণুয়াম শরদঃ শতং, প্রব্রবাম শরদঃ শতং,
অদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতং, ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ ॥ (শুক্ল যজুর্বেদ, ৩৬-২৪)
– একশ শরৎ দেখব মোরা ভুবনভরা সুখে।
বাঁচতে চাইগো শত শরৎ সুস্থ-সবল বুকে।
শুনব কথা শত শরৎ হয়ে চিরনবীন।
বলব কথা শত শরৎ সদা অমলিন।
আত্মা মোদের শত শরতে পূর্ণ ঋদ্ধিমান।
শত শরৎ পার হয়েও যে মোরা পূর্ণপ্রাণ।

পৃথিবী আমাদের দুহাত ভরে প্রাণময় জীবনের সঞ্জীবনী সুধা দিয়ে চলেছে। পৃথিবীকে সুস্থ রাখা, সুন্দর করে রাখা

তাই আমাদের একান্ত কর্তব্য। কোনোভাবেই আমরা যেন বিবেকহীন হয়ে পৃথিবীকে দূষিত না করি। আমাদের প্রাণের উৎসধারা এই পৃথিবীর পরিবেশকে বিপন্ন ও বিধ্বস্ত করার অধিকার নেই আমাদের। তাই ঋষিকবির একান্ত প্রার্থনা, তাঁর দ্বারা যেন পৃথিবীর কোনো ক্ষতি না হয়।

ওগো জননী বসুন্ধরা,
তোমার বক্ষে পা ফেলেছি বাম কিংবা ডান,
আমার দ্বারা হয় না যেন তোমার ক্ষতিসাধন।

এই পৃথিবীর প্রকৃতি ও পরিবেশকে ভালোবাসা, তার কোনো ক্ষতিসাধন না করার প্রেরণার উৎস সর্বভূতে আত্মদর্শন। আমরা যদি সর্বভূতে নিজেকে দেখার চেষ্টা করি, তাহলে এ বিশ্বের সবকিছুকে পরমাত্মীয় মনে হবে। ঈশোপনিষদে আছে –

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেব অনুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥ (ঈশ/৬)

'শিক্ষা' গ্রন্থের 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই মন্ত্রটির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে :

"যিনি সর্বভূতকে আপনারই মত দেখেন এবং আত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দেখেন, তিনি প্রচ্ছন্ন থাকেন না। আপনাকেই আপনাতেই যে বদ্ধ করে, সে থাকে লুপ্ত, আপনাকে সকলের মধ্যে যে উপলব্ধি করে সেই হয় প্রকাশিত।"[৩]

মূলত সর্বভূতে আত্মদর্শন করেই প্রাচীন সাহিত্যের ঋষিকবিগণ প্রকৃতির প্রতিটি সত্তার মধ্যে দৈবীসত্তা আরোপ করেছিলেন। এ সম্পর্কে অধ্যাপক ড. নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস বলেন :

হিন্দুর ভাবনায় প্রকৃতি ও মানুষ একীভূত হয়ে গেছে। বৃক্ষ, লতা-পাতা, জীব-জন্তু সব তার আপন। প্রকৃতির প্রতিটি চৈতন্যময় সত্তায় আছে তার দেবতা। তাই হিন্দুর দেবতা অনেক উপরে আসীন দণ্ডধারী কেউ নয়। হিন্দুর দেবতা আছে সূর্যের আলোয় আলোয়, আছে চাঁদের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায়, আছে নদী-সাগরের তরঙ্গে তরঙ্গে, আছে ঘাসে ঘাসে শিশিরের প্রতি বিন্দুতে, দেবতা আছে প্রতিটি ধূলিকণায়।[৪]

শুধু দৈবীসত্তা আরোপ নয়, প্রকৃতির মধ্যে মানবীসত্তাও আরোপ করেছেন প্রাচীন ভারতের ঋষিকবিগণ। যেমন তাঁদের ভাবনায় নদী রূপায়িত হয়েছে প্রাণবন্ত নারীরূপে। এমন ভাবনার মূল কারণ হলো প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি তাঁদের অসীম ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতাবোধ। নদী সবার কাছে উপকারী। নদীর জলে অবগাহন করে, তার স্বচ্ছ জলধারায় তৃষ্ণা নিবারণ করে ঋষিকবিগণ ভালোবাসায় কৃতজ্ঞতায় নদীর কাছে আনত হয়েছেন। কখন যে নদী তাঁদের কাছে দেবতা হয়ে গেছে, কিংবা হয়েছে নিজেরই অভিন্নসত্তা, পরমাত্মীয়া – তা তাঁরা ভুলে গেছেন। কখনও তাঁদের মনে অন্যরূপ জাগ্রত হয়নি। তাঁদের ভাবনায় ভালোবাসায় নদী পেয়েছে দেবীর অবয়ব। যে-কোনো পূজার জলশুদ্ধিকালে সাতটি নদীর মিলন বা আগমন কল্পনা করা হয়েছে।

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্মদে সিন্ধো কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥

এখানে লক্ষণীয় যে গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু, কাবেরী সর্বভারতীয় সাতটি নদী। এই সাতটি নদীর মধ্যদিয়ে ভারতীয় ঐক্যসাধনেরও একটা চমৎকার ভাবনা দেখা যায়।

কবি কালিদাসের রঘুবংশ মহাকাব্যে রামচন্দ্রের কাছে সরযূ নদী যেন তাঁর গর্ভধারিণী জননী। দীর্ঘ প্রবাসজীবনের পর অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের পথে সরযূ নদীকে দেখে তিনি সীতাকে বলেন :

জলানি যা তীরনিখাতযূপা বহত্যযোধ্যামনু রাজধানীম্ ।
তুরঙ্গমেধাবভৃথাবতীর্ণৈরিক্ষ্বাকুভিঃ পুণ্যতরীকৃতানি ॥

যাং সৈকতোৎসঙ্গসুখোচিতানাং প্রাজ্যৈঃ পয়োভিঃ পরিবর্ধিতানাম্।
সামান্যধাত্রীমিব মানসং মে সম্ভাবয়ত্যুত্তরকোসলানাম্ ॥
সেয়ং মদীয়া জননীব তেন মান্যেন রাজ্ঞা সরযূর্বিযুক্তা।
দূরে বসন্তং শিশিরানিলৈর্মাং তরঙ্গহস্তৈরুপগূহতীব ॥ (রঘুবংশ, ১৩/৬১-৬৩)

–রাজধানী অযোধ্যার উপকণ্ঠ দিয়ে যাঁর জলপ্রবাহ প্রবাহিত, ইক্ষ্বাকুবংশীয়েরা অশ্বমেধযজ্ঞের পর অবভৃথস্নানের জন্য অবতরণ করে যাঁর জল আরও পবিত্র করে তুলেছে, অযোধ্যাবাসীরা যাঁর সিকতাময় অঙ্গে অবস্থান করে পরম সুখভোগ করে, যাঁর জলপানে সবাই পরিবর্ধিত হচ্ছে এবং যিনি সকলের ধাত্রীরূপে পরিগণিত – ঐ দেখো, আমার মায়ের মতো সেই সরযূ, দূর দেশ থেকে ফিরেছি বলে নৃপতিবিরহী হয়ে আমাকে যেন তার বায়ুশীতল তরঙ্গরূপ বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করছে।

প্রাচীন সাহিত্যের কোনো কবির কাছে নদী কখনও মমতাময়ী মাতা, কখনও বা স্নেহময়ী ভগিনী, কখনও বা কারো সাধ্বী স্ত্রী, আদরিণী কন্যা, সমব্যথায় ব্যথিত সখী, কখনও বা কারো প্রেয়সী। ঋগ্বেদে মহর্ষি বিশ্বামিত্র বিপাশা ও শুতুদ্রী নদীদ্বয়কে ভগিনী বলে সম্বোধন করেছেন।

ও যু স্বসারঃ কারবে শৃণোত যযৌ বো দূরাদনসা রথেন।
নি যু নমধ্বং ভবতা সুপারা অধোঅক্ষাঃ সিন্ধবঃ স্রোত্যাভিঃ ॥ (ঋগ্বেদ, ৩/৩৩/৯)

–হে ভগিনীদ্বয়, আমি স্তব করছি। আমাকে শ্রবণ করো। আমি দূর দেশ হতে রথ ও অশ্ব নিয়ে এসেছি। তোমরা অবনত হও, যাতে সুখে পার হওয়া যাবে। হে নদীদ্বয়, তোমরা স্রোতের জল নিয়ে রথচক্রের অক্ষের অধোদেশে যাও।

কিন্তু বর্তমানে আমরা নদীকে কতটা ভালোবাসি? ঢাকা নগরীর পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া বুড়িগঙ্গা, এককালে যার স্বচ্ছ জলধারায় সবার মন জুড়িয়ে যেত, যার শান্ত-স্নিগ্ধ-শীতল হাওয়ায় নগরবাসী প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিত, আমাদের কারণে সেই বুড়িগঙ্গা আজ মৃতপ্রায়। নগরবাসীর বর্জ্য বহন করতে করতে বুড়িগঙ্গা আজ নিঃস্ব মলিন দূষিত রোগগ্রস্ত। বুকভরা নিঃশ্বাস নিতে নগরবাসী একসময় যার কাছে যেত, আজ তার পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় দুর্গন্ধের কারণে মানুষের নাসারন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায়। ঢাকা নগরের সমস্ত বর্জ্য বহন করার দায়িত্ব যেন বুড়িগঙ্গার। শুধু বুড়িগঙ্গা নয়, ঢাকা নগরের চার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া সকল নদী-খালের একই অবস্থা। অধিকাংশ নদী আজ দূষিত হয়ে মরতে বসেছে। বিশ্বব্যাংকের 'বাংলাদেশ পরিবেশ সমীক্ষা –২০১৭' শীর্ষক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ৭১৯টি তৈরি পোশাকশিল্পের ওয়াশিং ও বাইং কারখানা থেকে রাজধানীর চারপাশের নদীগুলিতে বর্জ্য এসে পড়ছে। এক টন কাপড় উৎপাদন করার বিনিময়ে নদীতে ২০০ টন বর্জ্য পানি তৈরি করা হচ্ছে।[৫] জলাশয়ে বর্জ্য ফেলা অত্যন্ত গর্হিত কর্ম। মনুসংহিতায় উল্লেখ আছে–

নাপ্সু মূত্রং পুরীষং বা ষ্ঠীবনং বা সমুৎসৃজেৎ।
অমেধ্যলিপ্তমন্যদ্বা লোহিতং বা বিষাণি বা ॥ (মনু, ৪/৫৬)

অর্থাৎ জলাশয়ে মলমূত্র, থুথু, রক্ত, বিষ ইত্যাদি ফেলা উচিত নয়, মলমূত্রযুক্ত বস্ত্রাদিও ধোয়া উচিত নয়। শুধু নদী বা জলাশয়ে নয়, পথঘাট, গোচারণভূমি, চাষযোগ্য জমি, জল, নদীতীর, ভাঙা মন্দির, পর্বতশীর্ষ ইত্যাদি স্থানে মলমূত্রত্যাগ অত্যন্ত গর্হিতকর্ম বলে ঘোষণা দিয়েছেন মনু –

ন মূত্রং পথি কুর্বীত ন ভস্মনি ন গোব্রজে।
ন ফালকৃষ্টে ন জলে ন চিত্যাং ন চ পর্বতে।
ন জীর্ণদেবায়তনে ন বল্মীকে কদাচন ॥
ন সসত্ত্বেষু গর্তেষু ন গচ্ছন্নাপি চ স্থিতঃ।
ন নদীতীরমাসাদ্য ন চ পর্বতমস্তকে ॥ (মনুসংহিতা, ৪/৪৫/৪৭)

বড়ই দুঃখের বিষয়, আমরা এতটাই আত্মহননে মত্ত ও অসচেতন যে আমাদের দেশে উল্লিখিত সকল স্থানে মলমূত্র দৃশ্যমান। সেন্টমার্টিন, কক্সবাজার, কুয়াকাটা থেকে শুরু করে চিম্বুক কিংবা সেই নীলগিরিচূড়াতেও দেখা যায় মনুষ্যসৃষ্ট বর্জ্য। জনগণকে সচেতন করার জন্য সাইনবোর্ডে অনেক নির্দেশ লেখা থাকে, কিন্তু কে শোনে কার কথা? আমরা কি নিজেদের সভ্য বলে গণ্য করতে পারি? কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে, সেই কতকাল পূর্বে ভারতবর্ষের প্রাচীন প্রাজ্ঞজনেরা পরিবেশ সম্পর্কে কতখানি সচেতন ছিলেন। তাঁদের এই শুভচেতনা আমাদের চিত্তে কি কোনো প্রেরণা দিতে পারে না?

ভূমিদস্যুদের আগ্রাসনের কারণে অবৈধ উপায়ে নদীদখল এদেশে যেন নিত্যদিনের ঘটনা। এতে নদী তার গতি হারিয়ে ফেলছে। একসময়ে যে নদীতে ছিল তরঙ্গমালা, যে নদী ছিল অনন্তযৌবনা, মানুষেরই অযত্ন-অবহেলায় সেই নদীতে আজ বার্ধক্যদশা, শৈবালদামে রুদ্ধবেগ স্রোতোধারা। নদীর বহমানতা অব্যাহত রাখার গুরুত্ব দিয়েছেন মনু–

> "নদী বেগেন শুধ্যতি" (৫/১০৮)।

অপরিকল্পিত বাঁধ দিয়ে নদীর মূলস্রোতকে অবরুদ্ধ করে রাখা, বাঁধ কেটে বা অন্যভাবে বহতা নদীর মূলস্রোত পরিবর্তন করা অত্যন্ত গর্হিত কর্ম। যারা এই ধরণের গর্হিতকর্মের সঙ্গে যুক্ত মনু তাদের দ্বিজাধম বলে আখ্যায়িত করে অপাঙ্‌ক্তেয় ঘোষণা করেছেন –

> স্রোতসাং ভেদকো যশ্চ তেষাং চাবরণে রতঃ।
> ...এতান্ বিগর্হিতাচারান্ অপাঙ্‌ক্তেয়ান্ দ্বিজাধমান্ ।
> ...বিবর্জয়েৎ ॥ (মনুসংহিতা, ৩/১৬৩, ১৬৭)

আমাদের দেশের নগরগুলিতে একটু বৃষ্টি হলেই জলাবদ্ধতার সীমাহীন দুর্ভোগের কথা আমরা সবাই জানি। গত ৩০/৫/১৭ তারিখে ঘূর্ণিঝড় 'মোরা'র আঘাতে অতিরিক্ত জোয়ারের জলে চট্টগ্রাম নগর দীর্ঘ এক সপ্তাহ যাবৎ জলাবদ্ধ ছিল। সরেজমিনে জানা যায়, চট্টগ্রাম নগরের উপকণ্ঠে একটি অপরিকল্পিত বাঁধ (চাকতাই খাল বাঁধ) এই জলাবদ্ধতার মূল কারণ। এই অপরিকল্পিত বাঁধ যারা তৈরি করেছে, তারা অপরাধী ও সর্বজনের অপাঙ্‌ক্তেয়। বিশ্বব্যাংকের 'বাংলাদেশ পরিবেশ সমীক্ষা-২০১৭' প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ২০১৭ সালের বর্ষা মৌসুমে রাজধানীতে কোনোমতে টিকে থাকা ১৩টি খালের মধ্যে মাত্র দুটি খাল সচল আছে। রাজধানীর পাশাপাশি ছোট জেলা শহরগুলিতে প্রতিনিয়ত জলাশয় ভরাট, দখল ও দূষণ চলছে। এই প্রতিবেদন থেকে আরও জানা যায়, পাবনা শহরে ১৯৯০ সালে জলাভূমি ছিল ৫৬৮ হেক্টর। ২০১৭ সালে তা ২৬৪ হেক্টরে নেমে এসেছে।[৬] যারা এই ভূমি দখলের সঙ্গে জড়িত, সরকারের কি উচিত নয় তাদের শাস্তি প্রদান করা? এক্ষেত্রে মনুর বিধান খুব কার্যকর ও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে আমরা মনে করতে পারি।

রামায়ণে দেখা যায়, সীতাহরণের পর রামচন্দ্র বনের বৃক্ষরাজি ও পশুদের কাছে সীতার সংবাদ জিজ্ঞাসা করেছেন। জনস্থানের তাল-তমাল, বেল-কদম, কুটজ-অর্জুন, আম-জাম-কাঁঠাল, অশোক, কুরব, ডালিম প্রতিটি বৃক্ষের নিকট আকুল হয়ে রামচন্দ্র সীতার সংবাদ জিজ্ঞাসা করেছেন। হস্তী, মৃগ, ব্যাঘ্র, ময়ূরসহ পঞ্চবটীর প্রতিটি প্রাণীর কাছেও রামচন্দ্রের আকুল জিজ্ঞাসা : 'তোমরা কি জানো জানকী কোথায়?' রামের দুঃখে সীতার কষ্টে পঞ্চবটীর বৃক্ষগুলো যেন কেঁদে আকুল। ফুল আর হরিণাদি পশুপাখি সকলে ম্লান, নিস্তেজ। বনদেবতারাও ত্যাগ করেছেন বনভূমি :

> রুদন্তমিব বৃক্ষৈশ্চ গ্লানপুষ্পমৃগদ্বিজম্।
> শ্রিয়াবিহীনং বিধ্বস্তং সন্ত্যক্তং বনদৈবতৈঃ ॥ (অরণ্যকাণ্ড, ৬০/৬)

গোদাবরী নদীর কাছে রামচন্দ্রের জিজ্ঞাসা : 'প্রিয়া সীতার সংবাদ বলো।' কিন্তু দুরাত্মা রাবণের ভীষণ চেহারা এবং সেরূপ কর্মের কথা চিন্তা করেই যেন গোদাবরী কিছু বলল না। নিরাশ হয়ে রামচন্দ্র তখন লক্ষ্মণকে বলেন–

এষা গোদাবরী সৌম্য কিঞ্চিন্ন প্রতিভাষতে। (অরণ্যকাণ্ড, ৬৪/১১)
– হে সৌম্য, এই গোদাবরী যে কিছুই বলছে না।

কবি বাল্মীকির লেখনীর যাদুস্পর্শে গোদাবরী এখানে শুধু নদী নয়, সীতার দুঃখে কষ্টে ক্লিন্ন মৌনী এক নারী।

মহামৃগগুলো বারবার রামচন্দ্রকে কিছু যেন বলতে চাইছে...সীতা হরণের কথা। রামচন্দ্র যখন তাদের দিকে তাকিয়ে বাষ্পরুদ্ধবাক্যে বলেন, 'ক্ব সীতা?' – কোথায় সীতা? তারা তখন সবাই দক্ষিণদিকে মুখ তুলে আকাশকে দেখাচ্ছিল–

দক্ষিণাভিমুখাঃ সর্বে দর্শয়ন্তে নভঃস্থলম্। (অরণ্যকাণ্ড, ৬৪/১৮)

যে দিক দিয়ে রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছিল, সংবেদনশীল মৃগেরা সেই দিকটি দেখিয়ে দিল। তারা তো কথা বলতে পারে না।

ঝর্ণাবাহী প্রস্রবণ পর্বতকে রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করেন, "ওগো পর্বতরাজ, তুমি কি সেই সর্বাঙ্গসুন্দরী সীতাকে দেখেছ?"

উবাচ রামো ধর্মাত্মা গিরিং প্রস্রবণাকুলম্।
কচ্চিৎ ক্ষিতিভৃতাং নাথ দৃষ্টা সর্বাঙ্গসুন্দরী । (অরণ্যকাণ্ড, ৬৪/২৯)

"রামের প্রতি সীতার ও সীতার প্রতি রামের প্রেম তাঁদের পরস্পর থেকে প্রতিফলিত হয়ে চারি দিকের মৃগ-পক্ষীকে আচ্ছন্ন করেছিল। তাঁদের প্রেমের যোগে তাঁরা কেবল নিজেদের সঙ্গে নয়, বিশ্বলোকের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়েছিলেন। এইজন্য সীতাহরণের পর রাম সমস্ত অরণ্যকেই আপনার বিচ্ছেদবেদনার সহচর হিসেবে পেয়েছিলেন। সীতার অভাব কেবল রামের পক্ষে নয় – সমস্ত অরণ্যই যে সীতাকে হারিয়েছে। কারণ, রাম-সীতার বনবাসকালে অরণ্য একটি নূতন সম্পদ পেয়েছিল – সেটি হচ্ছে মানুষের প্রেম। সেই প্রেমে তার পল্লবঘনশ্যামলতাকে, তার ছায়াগম্ভীর গহনতার রহস্যকে একটি চেতনার সঞ্চারে রোমাঞ্চিত করে তুলেছিল।"[৭]

অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন মন্তব্য করেছেন – "রামায়ণে বাল্মীকি দেখাইলেন রাম-সীতার জীবনে যাহা কিছু সুখ-শান্তি, তাহা তাঁহারা জনপদে পান নাই, তাহা পাইয়াছিলেন বনে।"[৮]

কবি কালিদাস প্রকৃতিকে ভালোবেসে তার মধ্যে মানবীসত্তা আরোপ করেছেন। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে শকুন্তলা তার প্রিয় লতার নাম রেখেছে বনজ্যোৎস্না, সে তার আদরের বোন। তার ফুল ফোটার দিনকে যৌবনসমাগম ভেবে তাকে একটি আম্রতরুর সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছে। এভাবে সম্পন্ন হয়েছে তাদের বিয়ে। আম্রতরুটি বর আর বনজ্যোৎস্না কনে। মা-হারা হরিণ শিশুটি তার সন্তান। আদর পাওয়ার বাসনায় তপোবনের কেসরবৃক্ষ যেন ইশারা করে শকুন্তলাকে কাছে ডাকে। নবমল্লিকার কথা শকুন্তলা ভুলে গেছে কি? – সখীরা জানতে চাওয়ায় তার উত্তর – ওকে ভুলব? তা হলে তো আমাকেই ভুলে যেতে হয়। পতিগৃহে যাওয়ার সময় বিদায়ক্ষণে প্রিয়ংবদা তাকে জানায় – দেখ শকুন্তলা, আশ্রম ত্যাগ করতে গিয়ে কেবল যে তোর কষ্ট হচ্ছে, তাই না। তপোবনভূমির সকল বৃক্ষ-লতা প্রাণিকুলও শোকে মুহ্যমান :

'ণ কেবলং তবোবণবিরহকাদরা সহী এব্ব। তুএ উবট্ঠিদবিওঅস্স তবোবণস্স বি দাব সমকখা দীসই।'

কবি কালিদাস শকুন্তলাকে প্রকৃতিকন্যা হিসেবেই সৃষ্টি করেছেন। শকুন্তলা বৃক্ষমূলে জল না দিয়ে কোনো দিন নিজে জলপান করেনি। অলঙ্কারপ্রিয় হয়েও সে কখনও কোনো বৃক্ষ-লতা থেকে ছিন্ন করেনি পুষ্প-পল্লব। তরুরাজিতে পুষ্পোদ্গম ছিল তার মহোৎসব। শকুন্তলার পতিগৃহে যাওয়ার সময় তপোবন-তরুগণকে সম্বোধন করে এই সম্পর্কের কথাই বলেছেন মহর্ষি কণ্ব :

পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বপীতেষু যা
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্ ।
অদ্যে বঃ কুসুমপ্রসূতিসময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্বৈরনুজ্ঞায়তাম্ ॥ (অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, ৪/৯)

রবীন্দ্রনাথের অনুবাদের ভাষায় :

তোমাদের জল না করি দান
যে আগে জল না করিত পান,
সাধ ছিল যার সাজিতে, তবু
স্নেহে পাতাটি না ছিঁড়িত কভু,
তোমাদের ফুল ফুটিত যবে
যে জন মাতিত মহোৎসবে,
পতিগৃহে সেই বালিকা যায়,
তোমরা সকলে দেহ বিদায়।

কণ্বমুনির তপোবন প্রকৃতির অভয়াশ্রম। সেখানকার সবাই প্রকৃতিকে ভালোবাসে। প্রকৃতি আশ্রমবাসীর পরম আত্মীয়। তাইতো আশ্রমের এক তাপস রাজা দুষ্যন্তকে হরিণ মারতে নিষেধ করে বলেন :

ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যো 'য়মস্মিন্
মৃদুনি মৃগশরীরে পুষ্পরাশাবিবাগ্নিঃ।
ক্ব বত হরিণকানাং জীবিতং চাতিলোলং
ক্ব চ নিশিতনিপাতা বজ্রসারাঃ শরাস্তে ॥ (অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, ১/১০)

– ফুলের মতো কোমল মৃগশরীরে অগ্নিতুল্য এই বাণ নিক্ষেপ করবেন না, নিক্ষেপ করবেন না। হরিণের জীবন খুবই চঞ্চল, কিন্তু আপনার বাণ অতি তীক্ষ্ণ ও বজ্রসম।

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে কবি কালিদাসের প্রকৃতি ভাবনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য এ ক্ষেত্রে স্মর্তব্য :

> অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে অনসূয়া-প্রিয়ংবদা যেমন, কণ্ব যেমন, দুষ্যন্ত যেমন, তপোবন প্রকৃতিও তেমনি একজন বিশেষ পাত্র।... প্রকৃতিকে মানুষ করিয়া তুলিয়া তাহার মুখে কথাবার্তা বসাইয়া রূপকনাট্য রচিত হইতে পারে; কিন্তু প্রকৃতিকে প্রকৃতি রাখিয়া তাহাকে এমন সজীব, এমন প্রত্যক্ষ, এমন ব্যাপক, এমন অন্তরঙ্গ করিয়া তোলা, তাহার দ্বারা নাটকের এত কার্যসাধন করাইয়া লওয়া, এ তো অন্যত্র দেখি নাই।[৯]

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আত্মিক সম্পর্কের কথা সুবিশাল সংস্কৃত সাহিত্যে নানা স্থানে নানাভাবে ছড়িয়ে আছে। প্রকৃতির প্রত্যেক উপাদান সংরক্ষণের প্রতি গভীর গুরুত্বও প্রদান করা হয়েছে। বৃক্ষ-লতা-পাতা প্রকৃতির পরম মিত্র। বৃক্ষনিধন ও অকারণে প্রাণিহত্যাকে নিন্দা করে পঞ্চতন্ত্রের কবি বিষ্ণুশর্মা বলেছেন :

বৃক্ষাংশ্ছিত্বা পশূন্ হত্বা কৃত্বা রুধিরকর্দমম্ ।
যদ্যেব গম্যতে স্বর্গং নরকং কেন গম্যতে ॥ (পঞ্চতন্ত্র, কাকোলুকীয়, ১০৬)

অর্থাৎ বৃক্ষসমূহ ছেদন করে, পশু হত্যা করে, পশুরক্তে মাটি ভিজিয়ে কর্দমাক্ত করে যদি স্বর্গে যেতে হয়, তবে নরকগমনের পথ কোনটা?

রামায়ণে নিসর্গ রক্ষা ও জীবজন্তু সংরক্ষণে সচেতনতার উপর অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভরত রাম-লক্ষ্মণের সন্ধানে এসে ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রমে শুধু ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সৈন্যবাহিনীকে তপোবন হতে অনেক দূরে রেখে এসেছিলেন। এটা জানতে পেরে ভরদ্বাজ ঋষি ভরতকে জিজ্ঞাসা করেন – তোমার সৈন্যদের কেন এখানে আনলে না? কেন দূরে রেখে এলে? তখন ভরত তাঁকে বলেন : তারা আশ্রমের বৃক্ষ, জল, ভূমি এবং পর্ণশালাগুলির যাতে ক্ষতি না করে, সেজন্য আমি একাই এসেছি :

তে বৃক্ষানুদকং ভূমিমাশ্রমেষূটজাংস্তথা।
ন হিংস্যুরিতি তেনাহমেক এবাগতস্ততঃ ॥ (অযোধ্যাকাণ্ড, ৯১/৯)

একটু ঝড় হলেই আমাদের দেশে অনেক বৃক্ষ উপড়ে পড়ে। এমন কি নগরজীবনেও রাস্তার ধারে কৃষ্ণচূড়া গাছ উপড়ে পড়ে পথচারীর অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর সংবাদ শোনা যায়। রামায়ণে উল্লেখ আছে, সুশাসকের রাজ্যে বৃক্ষের মূল দৃঢ় থাকে। বৃক্ষের সঠিক পরিচর্যা করে, তার শেকড় মাটির গভীরে স্থিত কিনা তা লক্ষ রাখার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে রামায়ণ। রামরাজ্যের বর্ণনায় পাওয়া যায় – রামচন্দ্রের শাসনামলে বৃক্ষের মূল দৃঢ় ছিল। অর্থাৎ বৃক্ষ হঠাৎ উপড়ে পড়ে যেত না। কারও কোনো ক্ষতিও হতো না। পুষ্পময় ছিল বৃক্ষ। প্রয়োজন অনুপাতে বৃষ্টি হতো। বায়ু ছিল সুখস্পর্শ।

> নিত্যমূলা নিত্যফলাস্তরবস্তত্র পুষ্পিতাঃ।
> কামবর্ষী চ পর্জন্যঃ সুখস্পর্শশ্চ মারুতঃ॥ (যুদ্ধকাণ্ড, ১২৮/১০৩)

বৃক্ষের প্রতি কেন এমন সহৃদয় হতে হবে? কেননা মানুষের মতো বৃক্ষেরও চেতনাশক্তি আছে। ১৯০২ সালে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রচিত 'Response in the living and Non-living' গ্রন্থ থেকে আমরা প্রথম জানতে পারি– বৃক্ষের প্রাণময় সত্তা আছে, আছে তার চেতনাশক্তি। ঠিক এমনই কথা মনু বলেছেন অনেক পূর্বে –

"অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতা"। –(মনু, ১/৪৯)। অর্থাৎ বৃক্ষেরও আছে প্রাণশক্তি, আছে দুঃখ-সুখের অনুভবশক্তি। আনন্দ ও বিস্ময় দুইই অনুভব করি মনুসংহিতার এই তথ্য জেনে। বৃক্ষছেদন ও বৃক্ষনিধনকে মনু পাপকর্ম বলেছেন। এ সম্পর্কে মনুসংহিতায় আরও উল্লেখ আছে, যারা পবিত্র তড়াগ বা উদ্যান বিক্রয় করে, ওষধি নষ্ট করে ও জ্বালানি কাঠের জন্য বৃক্ষছেদন করে, তারা সবাই উপপাতক। (মনু, ১১/৬২, ৬৪, ৬৫)

মহাভারতেও উল্লেখ আছে, বৃক্ষের আছে প্রাণ, আছে সুখ-দুঃখের অনুভবশক্তি (শান্তিপর্ব, ১৮৪)। তাই বৃক্ষে তীব্র বিষ প্রয়োগ করলে সে মূর্ছা যায়। তার সেবা করলে পুনরায় সুস্থ হয়–

> স তীক্ষ্ণবিষদিগ্ধেন শরেণাতিবলাৎ ক্ষতঃ।
> উৎসৃজ্য ফলপত্রাণি পাদপঃ শোষমাগতঃ॥ (অনুশাসন পর্ব, ৫/৬)
> ভস্মরাশিকৃতং বৃক্ষং বিদ্যয়া সমজীবয়ৎ। (আদিপর্ব, ৪৩/৯)

অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় বৃক্ষেরও রয়েছে আপন মনোভাব প্রকাশ করার ভাষা– "ভাষাজ্ঞশ্চ শরীরিণাম্" (অনুশাসন, ১১৭/৮)। বৃক্ষের রয়েছে শ্রবণস্পর্শনাদির শক্তি। মহর্ষি ভরদ্বাজ মহর্ষি ভৃগুকে বৃক্ষের শ্রবণাদি ইন্দ্রিয় আছে কি না এই প্রশ্ন করেন। উত্তরে ভৃগু বলেছেন, পাতা-ত্বক-ফুল-ফল সময়বিশেষে ম্লান হয়ে যায়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, বৃক্ষেও আছে তেজঃপদার্থ। বৃক্ষের ম্লানতা ও শীর্ণতা দেখে তার স্পর্শানুভূতির অনুমান করা যায়। বায়ুর স্পর্শ, অগ্নির তাপ এবং বজ্রের নির্ঘোষে ফুল-ফল শীর্ণ হয়ে যায়। এতে অনুধাবন করা যায়, বৃক্ষের শ্রবণশক্তি রয়েছে। দূরস্থ লতা তার অবলম্ব্য বৃক্ষের দিকে অগ্রসর হয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে। এতে অনুমিত হয় যে, বৃক্ষের দৃষ্টিশক্তি রয়েছে। নানাবিধ গন্ধদ্রব্য ও ধূপের সুগন্ধে বৃক্ষের অনেক রোগ নাশ হয়। অতএব বৃক্ষের রয়েছে গন্ধ গ্রহণ করবার ক্ষমতা। বৃক্ষের প্রফুল্লতা দেখে সুখের অনুমান ও ম্লানতা দেখে দুঃখের অনুমান করা যায় এবং ছিন্ন অঙ্গের পুনরায় উৎপত্তি দেখে মনে হয় বৃক্ষের প্রাণ আছে :

> উষ্মতো ম্লায়তে পর্ণং ত্বক্ ফলং পুষ্পমেব।
> ম্লায়তে শীর্য্যতে চাপি স্পর্শস্তেনাত্র বিদ্যতে॥
> বায়গ্ন্যশনিনির্ঘোষৈঃ ফলং পুষ্পং বিশীর্য্যতে।
> শোত্রেণ গৃহ্যতে শব্দস্তস্মাচ্ছৃণ্বন্তি পাদপাঃ॥
> বল্লী বেষ্টয়তে বৃক্ষং সর্ব্বতশ্চৈব গচ্ছতি।
> ন হ্যদৃষ্টেশ্চ মার্গোঽস্তি তস্মাৎ পশ্যন্তি পাদপাঃ॥
> পুণ্যাপুণ্যৈস্তথাগন্ধৈর্ধূপৈশ্চ বিবিধৈরপি।
> অরোগাঃ পুষ্পিতাঃ সন্তি তস্মাজ্জিঘ্রন্তি পাদপাঃ॥
> পাদৈঃ সলিলপানাচ্চ ব্যাধীনাঞ্চাপি দর্শনাৎ।

ব্যাধিপ্রতিক্রিয়াত্বাচ্চ বিদ্যতে রসনং দ্রুমে ॥
বক্রেণোৎপলনালেন যথোর্দ্ধং জলমাদদেৎ।
তথা পবনসংযুক্তঃ পাদৈঃ পিবতি পাদপঃ ॥
সুখদুঃখয়োশ্চ গ্রহণাচ্ছিন্নস্য চ বিরোহণাৎ।
জীবং পশ্যামি বৃক্ষাণামচৈতন্যং ন বিদ্যতে ॥ (শান্তিপর্ব, ১৮৭/১১-১৭)

অনুশাসনপর্বে উল্লেখ আছে– বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, বল্লী, ত্বক্সার ও তৃণ এই ছয় শ্রেণিতে বৃক্ষাদি বিভক্ত – বৃক্ষগুল্মলতাবল্ল্যস্ত্বক্সারাস্তৃণজাতয়ঃ ॥ (অনুশাসনপর্ব, ৪৭/২৩)। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম বলেন, উদ্যান ও উপবন রচনায় বহু সুকৃতি রয়েছে । বৃক্ষরোপণে ইহলোকে কীর্তি ও পরলোকে শুভফল লাভ হয় :

এতে জাত্যস্তু বৃক্ষাণাং তৈষাং রোপে গুণাস্ত্বিমে।
কীর্তিশ্চ মানুষে লোকে প্রেত্য চৈব ফলং শুভম্ ॥ (অনুশাসনপর্ব, ৪৭/২৪)

একারণে ভীষ্ম বলেন, বৃক্ষরোপণ করবে– তস্মাদ্ বৃক্ষাংশ্চ রোপয়েৎ ॥ (অনুশাসনপর্ব, ৪৭/২৬)

ভাগবত পুরাণে উল্লেখ আছে, বাইরে বৃক্ষলতার চৈতন্য দেখা না গেলেও অন্তরে অন্তরে তাদের রয়েছে সুগভীর চেতনা – অন্তঃস্পর্শা বিশেষিণঃ ॥ (ভাগবত পুরাণ, তৃতীয় স্কন্ধ)।

বৃক্ষের কল্যাণকর ভূমিকার কথা উল্লেখ করে ভাগবতে বলা হয়েছে, বৃক্ষ তার সর্বস্ব পরের জন্য উৎসর্গ করে সকলের সব কামনা পূর্ণ করে – সর্বান্ কামান্ বিতন্বতে ॥ (ভাগবতপুরাণ, দশম স্কন্ধ)।

অর্থশাস্ত্রকার কৌটিল্য প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষায় বৃক্ষের অবদান সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা করেছেন। বৃক্ষ ব্যতীত মানুষ ও প্রাণিজগৎ বাঁচতে পারে না। কৌটিল্য মনে করতেন, বৃক্ষছেদনে বৃক্ষের শারীরিক কষ্ট হয়। এজন্য বৃক্ষের প্রতি সহৃদয়বোধে ভাবিত হয়ে তিনি বৃক্ষছেদনকে অপরাধকর্ম হিসেবে গণ্য করেছেন এবং বৃক্ষছেদনকারীকে নানারকম জরিমানা প্রদানের বিধান দিয়েছেন। যেমন, বৃক্ষের ক্ষুদ্রশাখা ছেদনের জন্য ১২ পণ, পীনশাখা অর্থাৎ মোটাশাখা ছেদনের জন্য ২৪ পণ, বৃক্ষস্কন্ধ ছেদনের জন্য ২৫০ পণ এবং কোনো বৃক্ষ সমূলে উৎপাটন করলে অপরাধীকে ৫০০ পণ জরিমানা দিতে হতো। তিনি নগর-উদ্যানের ফুল-ফলসমন্বিত ছায়াতরু কাটতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। পুষ্প-ফলছায়াযুক্ত লতা থেকে পল্লব ছেদন করলে এবং পুণ্যস্থান, তপোবন ও শ্মশানস্থিত বৃক্ষের পল্লবাদি ছেদন করলে উপযুক্ত জরিমানা দিতে হতো। আবার জনপদের সীমাস্থিত বৃক্ষ, মূল্যবান কোনো বৃক্ষ কিংবা রাজার উদ্যানে স্থিত বৃক্ষছেদন করলে অপরাধীরা পূর্বোক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ পরিমাণে জরিমানা দিতে বাধ্য থাকত :

পুরোপবনবনস্পতীনাং পুষ্পফলচ্ছায়াবতাং প্ররোহচ্ছেদনে ষটপণঃ। ক্ষুদ্রশাখাচ্ছেদনে দ্বাদশপণঃ। পীনশাখাচ্ছেদনে চতুর্বিংশতিপণঃ। স্কন্ধবধে পূর্বঃ সাহসদণ্ডঃ। সমুচ্ছিত্তৌ মধ্যমঃ।

পুষ্প-ফল-চ্ছায়াবদ্গুল্মলতাস্বর্ধদণ্ডঃ। পুণ্যস্থান-তপোবন-শ্মশান-দ্রুমেষু চ।

সীমবৃক্ষেষু চৈত্যেষু দ্রুমেষ্বালক্ষিতেষু চ।
ত এব দ্বিগুণা দণ্ডাঃ কার্যা রাজবনেষু চ ॥ (অর্থশাস্ত্র, ৩/১৯/৭)

কোনোভাবে বৃক্ষের ক্ষতিসাধন করা যাবে না, এই উদ্দেশ্যে যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতাতেও রয়েছে অর্থশাস্ত্রের ন্যায় বিধান–

প্ররোহিশাখিনাং শাখাস্কন্ধাবিদারণে।
উপজীব্য-দ্রুমাণাঞ্চ বিংশতি র্দ্বিগুণো দমঃ ॥
চৈত্যশ্মশানসীমাসু পুণ্যস্থানে সুরালয়ে।
জাতদ্রুমাণাং দ্বিগুণো বৃক্ষেহ্থ বিশ্রুতে ॥
গুল্মগুচ্ছক্ষুপলতা-প্রতানৌষধিবীরুধাম্ ।

পূর্বস্মৃতাদর্দ্ধদণ্ডঃ স্থানেম্বুক্তেষু কর্তনে ॥ (যাজ্ঞবলবক্যসংহিতা, ২/২৩০-২৩৩)

এভাবে সবুজায়ন সৃষ্টিতে রাষ্ট্রের প্রখর দৃষ্টি থাকায় সে সময় পরিবেশ সুরক্ষিত ছিল।

বর্তমান বিশ্বে পরিবেশ চেতনা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের রক্ষণাবেক্ষণ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উদ্যোগ, উদ্বেগ ও আলাপ-আলোচনার অন্ত নেই। ১৯৭২ সালে স্টকহোমে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্যোগে প্রথম আন্তর্জাতিক পরিবেশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গঠিত হয় আন্তর্জাতিক পরিবেশ সংস্থা। ১৯৯২ সালে ব্রাজিলে রিও ডি জেনেরিও শহরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক পরিবেশ সম্মেলনে বিশ্বের পরিবেশকে সুস্থ রাখার উদ্দেশ্যে কয়েকটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গৃহীত হয়। পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মানোন্নয়ন এবং পরিবেশদূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনকল্পে ১৯৯৫ সালে প্রণীত হয়েছে 'বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫'। এই আইন অনুযায়ী জলাধার, পাহাড় ও টিলা, বনভূমি এবং বন্যপ্রাণী সহ প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও উৎকর্ষ বিধান এবং জীবন্ত প্রাণীসমূহের প্রতি সমবেদনা প্রদর্শন করা সকল নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য।

কিন্তু বর্তমানে আমরা কী দেখছি? ১৩/৬/১৭ তারিখে রাঙামাটি, চট্টগ্রাম ও বান্দরবানে পাহাড়ধসে ১২৭ জন নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরও অনেকে। প্রত্যেক বছর পাহাড়ধসে মৃত্যু ঘটছে অনেকেরই। এর প্রধান কারণ পাহাড় কেটে অপরিকল্পিত বসতি স্থাপন। ৩৩টি পাহাড়ে ১০ লক্ষ মানুষ ঝুঁকিপূর্ণভাবে বসবাস করছে।[১০]

দেশকে বনায়ন ও সবুজায়ন করে গড়ে তোলার উদ্যোগ রাষ্ট্রের রয়েছে। কিন্তু সেই উদ্যোগ কি যথেষ্ট? রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বিভিন্ন সামাজিক বনায়ন গড়ে উঠলেও সেগুলি সংরক্ষণে রাষ্ট্র কি যথার্থ ভূমিকা পালন করছে? পরিবেশ ও বনমন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে অনেক উদ্যোগ গৃহীত হচ্ছে। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি থাকলেও সেই বৃক্ষকে যথার্থভাবে রক্ষা করা হচ্ছে না। কখনও বনবিভাগের অসাধু কর্মকর্তাদের সাহায্যে, কখনও বা তাদের অজ্ঞাতে বনদস্যুরা নির্বিচারে বৃক্ষছেদন করছে। অনেক সময় এমনও সংবাদ শোনা যায় যে ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে প্রতিপক্ষের ফলদ বাগানের বৃক্ষগুলিকে নির্মমভাবে নিধন করা হয়। এদের শাস্তিপ্রদানে অধিকাংশ সময়ে রাষ্ট্র নির্বিকার থাকে। এখানে রাষ্ট্রের অবশ্যই নির্বিকার থাকা উচিত নয় এবং অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত বিধানের মতো বর্তমানেও অপরাধীদের শাস্তি প্রদান করা উচিত।

আশার ব্যাপার হলো রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পাশাপাশি অনেক সামাজিক প্রতিষ্ঠান এমনকি ব্যক্তিগত উদ্যোগেও অনেকে বনায়নের কাজ করছে। যেমন 'তরুপল্লব' নামক একটি বৃক্ষপ্রেমী সংগঠন বৃক্ষরোপণসহ বৃক্ষের সেবামূলক নানা কর্মসাধন করে চলেছে। আবার কার্তিক পরামানিকের মতো অনেক বৃক্ষপ্রেমী আমাদের সমাজে রয়েছেন। তাঁরা আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল হয়েও নিজ অর্থব্যয়ে বৃক্ষরোপণ করেন, তাদের অপত্যস্নেহে লালন করে গড়ে তোলেন সবুজ বনায়ন। বৃক্ষকে অপত্যস্নেহে লালন করার কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ল সুরপাল রচিত বৃক্ষায়ুর্বেদের একটি শ্লোকের কথা। এই শ্লোকে একটি বৃক্ষকে দশটি পুত্রের সমতুল্য গণ্য করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে–

দশকূপসমা বাপী, দশবাপীসমো হ্রদঃ।
দশহ্রদসমঃ পুত্রো দশপুত্রসমো দ্রুমঃ ॥

মহাভারতেও বৃক্ষকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে – বৃক্ষ রোপণকর্তার পুত্রতুল্য, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই : তস্য পুত্রা ভবন্ত্যেতে পাদপা নাত্র সংশয়ঃ (অনুশাসন পর্ব, ৪৭/২৭)। বৃক্ষরোপণের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে মহাভারতের ভীষ্ম আরও বলেন, যাঁরা কল্যাণকামী মানুষ, তাঁরা জলাশয়ের তীরে উৎকৃষ্ট বৃক্ষসকল রোপণ করবে এবং তাদের পুত্রের ন্যায় সব সময় পরিপালন করবে। কেননা সেই বৃক্ষসকল ধর্মানুসারে রোপয়িতার পুত্রই হয় :

তস্মাত্তড়াগে সদ্বৃক্ষা রোপ্যাঃ শ্রেয়ো র্থিনা সদা।
পুত্রবৎ পরিপাল্যাশ্চ পুত্রাস্তে ধর্ম্মতঃ স্মৃতাঃ ॥ (অনুশাসন পর্ব, ৪৭/৩১)

যাঁরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে সবুজ বনায়ন গড়ে তুলছে, রাষ্ট্রের উচিত তাঁদের এই মহৎ কর্মকে উৎসাহিত করা। এ সম্পর্কে অর্থশাস্ত্রে এই বিধান রয়েছে যে, ব্যক্তিগত উদ্যোগে কেউ উদ্যানাদি নির্মাণ করলে রাষ্ট্রীয়ভাবে তাঁকে সাহায্য করা উচিত– "অন্যেষাং চ বধ্নতাং ভূমিমার্গবৃক্ষোপকরণানুগ্রহং কুর্যাৎ, পুণ্যস্থানারামাণং চ" (অর্থশাস্ত্র, ২/১/২১)।

পশু-পাখিদের উপকারিতা ও তাদের সংরক্ষণের ব্যাপারে কৌটিল্য সচেতন ছিলেন। অর্থশাস্ত্র থেকে জানা যায়, গৃহপালিত ও বন্য উভয় জাতীয় প্রাণীকে রক্ষার দিকে কৌটিল্যের সজাগ দৃষ্টি ছিল। গাছ-পালার মতো পশু-পাখিকে দৈহিক যন্ত্রণা বা তাদের মৃত্যু ঘটানো গুরুতর অপরাধ বলে গণ্য করা হতো। এ সব অপরাধের জন্য নানারকম জরিমানার বিধান ছিল। গবাদি পশুকে হত্যা বা অন্যকে দিয়ে হত্যা করানো এবং হরণ করা বা হরণ করানোর জন্য অপরাধীর বধদণ্ডের বিধান ছিল।

স্বয়ং হন্তা ঘাতয়িতা হর্তা হারয়িতা চ বধ্যঃ। (অর্থশাস্ত্র, ২/২৯/৫)

জীবসংরক্ষণে মনুর বিধান অবশ্য স্মরণীয়। মনুর মতে, হাতি, ঘোড়া, গাধা, উট, হরিণ, মোষ, ছাগল, ভেড়া, এমনকি মাছ, সাপ ইত্যাদি মারা পাপকর্ম। যারা এই পাপকর্ম করে, তারা সংকরীকরণ নামক উপপাতক–

খরাশ্বোষ্ট্রমৃগেভানামজাবিকবধস্তথা।
সংকরীকরণং জ্ঞেয়ং মীনাহিমহিষস্য চ ॥ (মনুসংহিতা, ১১/৬৮)

আচার্য, পিতামাতা, গুরু, ব্রাহ্মণ, তপস্বীর সঙ্গে হিংস্র আচরণ আর গরুর ওপর অত্যাচার মনুর কাছে সমান অপরাধ।

ন হিংস্যাদ্ ব্রাহ্মণান্ গাশ্চ সর্বাংশ্চৈব তপস্বিনঃ ॥ (মনুসংহিতা, ৪/১৬২)

অকারণে পশুহত্যা পাপ। কিন্তু পশু যখন খাদ্য তখন তো তাকে হত্যা করা ছাড়া উপায় থাকে না। মনু লক্ষ করেছেন জীবজগতে খাদ্যখাদক সম্বন্ধের পরম্পরা কিভাবে পরিবেশের সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলেছে। মনু বলেছেন: ঘাসপাতা হরিণের খাদ্য, হরিণ বাঘের খাদ্য, মাছ মানুষের খাদ্য, হাতি সিংহের খাদ্য। এ খাদ্যশৃঙ্খলা মূলত বিধাতার বিধান অর্থাৎ এটি প্রকৃতির নিয়ম :

চরাণাম্ অন্নম্ অচরা দংষ্ট্রিণামপ্যদংষ্ট্রিণঃ।
অহস্তাশ্চ সহস্তানাং শূরাণাং চৈব ভীরবঃ ॥ (মনুসংহিতা, ৫/২৯)

মনুর মতে যে সকল প্রাণী কোনোভাবেই খাওয়া উচিত নয়, তারা হলো– কাঁচা মাংসখেকো চিল, শকুন, পায়রা, টিট্টিভ, চড়াই, হাঁস, চক্রবাক, গ্রাম্যমোরগ, সারস, শুক-সারি, পানকৌড়ি, বক, দাঁড়কাক, খঞ্জন ইত্যাদি। (মনুসংহিতা, ৫/১-১৪)। পশু-পাখি ও প্রাণীদের সংরক্ষণে কৌটিল্য বিচিত্র বনভূমির উল্লেখ করেছেন। যেমন : পশুবন, মৃগবন, হস্তিবন, পক্ষিবন, ব্যালবাট ও বিবীত অর্থাৎ তৃণভূমির উল্লেখ করেছেন। পাশ অর্থাৎ ফাঁদ, জাল এবং কুটাবপাতে অর্থাৎ পশুদের আটকাবার জন্য তৃণাদির দ্বারা আচ্ছাদিত কৃত্রিম গর্তে বদ্ধ মৃগ, অন্যান্য পশু, পাখি, ব্যাল (হিংস্র জন্তু) ও মৎসগ্রহণকারীকে দণ্ডরূপে সেই অপহৃত দ্রব্যের সমান অর্থমূল্য দিতে হবে। মৃগবন ও দ্রব্যবন থেকে মৃগ ও চন্দনাদি বৃক্ষের অপহরণের জন্য অপহরণকারীকে ১০০ পণ দণ্ডের বিধান দিয়েছেন কৌটিল্য। আবার বিম্ব অর্থাৎ বিচিত্রবর্ণের গিরগিটি জাতীয় প্রাণী, বিহারমৃগ ও শুকাদি ক্রীড়াপক্ষী বধ করলে অপরাধীকে ২০০ পণ দণ্ডের বিধান রয়েছে অর্থশাস্ত্রে :

পাশজালকূটাবপাতেষু বদ্ধানাং মৃগ-পশু-পক্ষি-ব্যাল-মৎস্যানাম্ আদানে তচ্চ তাবচ্চ দণ্ডঃ।
মৃগ-দ্রব্য-বনাৎ মৃগদ্রব্যাপহারে শত্যো দণ্ডঃ।
বিম্ব-বিহারমৃগ-পক্ষি-স্তেয়ে হিংসায়াং বা দ্বিগুণো দণ্ডঃ। (অর্থশাস্ত্র, ৪/১০/৩)

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণার্থে আমাদের আরও সচেতন হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমান সরকার পশু-পাখি সংরক্ষণের প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কিন্তু কেবল উদ্যোগ গ্রহণ করলে হবে না। তার যথাযথ বাস্তবায়ন হতে হবে। এই বাস্তবায়নের অনেক অভাব আছে। প্রত্যেক বছর শীতকালে আমাদের দেশে অতিথি পাখি বেড়াতে আসে। তারা

আসে বাঁচার জন্য, তারা খাবারের সন্ধানে এসে নিজেরাই অন্যের খাবার হয়ে যায়। যারা এই অতিথিদের হত্যা করে খাদ্য হিসেবে ভোজন করে, তারা যে কতটা অমানবিক তা তারা নিজেরাই জানে না। পাখিহত্যা করলে বা পাখি শিকার করা অবস্থায় ধরা পড়লে অপরাধীকে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করার আইন রয়েছে। কিন্তু এই আইনের প্রয়োগ খুব কম পরিলক্ষিত হয়। সরকারের পশুপাখি সংরক্ষণের বিষয়ে আরও সজাগ দৃষ্টির প্রয়োজন রয়েছে। আশার ব্যাপার হলো, সরকারের পাশাপাশি অনেক সামাজিক সংগঠন কিংবা ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হচ্ছে পাখিদের সংরক্ষণ সম্পর্কিত কার্যাবলি। যেমন, খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলায় 'সোনামুখ' সংগঠন পাখিদের সংরক্ষণে, তাদের বাসা নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। পাখিহত্যা অন্যায়কর্ম– এই বোধ জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই সংগঠন 'পাখি সম্পর্কিত সচেতনতার গান' গেয়ে গেয়ে মানুষের মধ্যে এই শুভবোধ জাগিয়ে তুলছে। প্রকৃতি ও পরিবেশ মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু। এটি অনুধাবন করেছিলেন প্রাচীন সাহিত্যের ঋষিকবিগণ। পরিবেশকে সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখার জন্য তাঁদের আপ্রাণ চেষ্টা ছিল। এরই ধারাবহিকতায় তাঁরা প্রকৃতির প্রতি মমত্ববোধ জাগ্রত করার জন্য তাতে প্রাণসত্তা আরোপ করে প্রকৃতিকে আপন আত্মীয়রূপে ভাবতে শিখিয়েছেন। কখনও পাপের ও শাস্তির ভয় দেখিয়ে মানুষকে তাঁরা প্রকৃতি ও পরিবেশের ধ্বংসমূলক কর্ম থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতি নিয়ে তাঁদের ভাবনা ছিল উদার। তাঁরা স্বপ্ন দেখতেন ও আকাঙ্ক্ষা করতেন, নির্মল পরিবেশের পৃথিবী। তাঁদের দৃষ্টিতে প্রকৃতির সবকিছু ছিল সুন্দর ও মধুময়।

কিন্তু আজ আমরা কী দেখছি? আজ আমাদের পৃথিবী কেমন আছে? কেমন আছে এই পৃথিবীর প্রকৃতি ও পরিবেশ? পরিবেশ দূষণে আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত এই পৃথিবী যেন আমাদের মৃতপ্রায় জননী। অসুস্থ জননীকে সুস্থ করার দায়িত্ব আমাদের সকলের। আর এ জন্য প্রয়োজন মাতা বসুন্ধরার প্রতি অসীম ভালোবাসা। এই ভালোবাসার উৎস আমাদের প্রাচীন সাহিত্য। আর এই ভালোবাসার প্রেরণাদাতা আমাদের পূর্বসূরিগণ, প্রাচীন সাহিত্যের ঋষিকবিগণ। বৈদিক ঋষিকবির মতো আমাদেরও হোক এই প্রার্থনা– এই পৃথিবীর আলো-বাতাস, বৃক্ষরাজি, নদ-নদী, প্রতি ধূলিকণা সমস্ত প্রকৃতি প্রাণবন্ত ও মধুময় হয়ে উঠুক :

মধু বাতা ঋতায়তে
মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বী র্নঃ সন্তোষধীঃ ॥
মধু নক্তমুতোষসো
মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা ॥
মধুমান্ নো বনস্পতি-
র্মধু মাঁ অস্তু সূর্য্যঃ।
মাধ্বী র্গাবো ভবন্তু নঃ ॥

–মধু বহিছে সকল বাতাস। মধু ক্ষরিছে নদ ও নদী। মধু হোক আমাদের ওষধি সকল। মধু হোক রজনী ও ঊষা। মধুময় হোক পৃথিবীর ধূলিকণা! মধু হোক আমাদের পালয়িতা ঐ দ্যুলোক! মধুময় হোক আমাদের বনস্পতি! মধুময় হোক ঐ সূর্য! মধুময় হোক আমাদের ধেনুগণ!

পরিবেশ নিয়ে এমন ভাবনা একজন সচেতন পরিবেশপ্রেমীর কাছে সেকাল, একাল এবং কালান্তরেও সমভাবে প্রাসঙ্গিক।

তথ্যনির্দেশঃ

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, ১৯৯২, পৃ. ৩১৭

২. শ্রীক্ষিতিমোহন সেন, *রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন*, পুনশ্চ, ২০০৯, পৃ. ৩৭০

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *শিক্ষা*, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ষষ্ঠ খণ্ড, পাঠক সমাবেশ, ২০১১

৪. নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস, *দেবভাবনা*, মঙ্গলালোক, সরস্বতী পূজা ১৪২৩, অফিসার্স ক্লাব, ঢাকা, পৃ. ৩২

৫. দৈনিক প্রথম আলো, ১১ ডিসেম্বর, ২০১৭।

৬. ঐ

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *তপোবন* (শান্তিনিকেতন), *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, পাঠক সমাবেশ, ২০১১, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৬৯৮।

৮. শ্রীক্ষিতিমোহন সেন, *রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন*, পুনশ্চ, ২০০৯, পৃ. ৪৩৬

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পাঠক সমাবেশ, ২০১১, পৃ. ৭২৮।

১০. দৈনিক প্রথম আলো, ১৪ জুন, ২০১৭

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, মহেশচন্দ্র ঘোষ [অনূদিত ও সম্পাদিত], (১৯৮৬)। *উপনিষদ*, অখণ্ড সংস্করণ, হরফ প্রকাশনী, কলিকাতা

অমলেশ ভট্টাচার্য, (২০১১)। রামায়ণ কথা, প্রথম প্রতিভাস সংস্করণ, বইপাড়া পাবলিকেশনস্, কলকাতা

করুণাসিন্ধু দাস, (২০০৩)। *সংস্কৃত সাহিত্য পরিক্রমা*, রত্নাবলী, কলকাতা

ক্ষিতিমোহন সেন, (১৯৯৩)। *বাংলার বাউল*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, কলকাতা

ক্ষিতিমোহন সেন, (২০১০)। *রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন*, পুনশ্চ, কলকাতা

দুলাল ভৌমিক, [অনূ] (২০১০)। *বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্র*, সাহিত্য বিলাস, ঢাকা

নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস, *কালিদাসের শকুন্তলা*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মহর্ষি বাল্মীকি, (১৯৭৬)। *রামায়ণম্*, ড. ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত ও অনূদিত, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা

মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস, (১৩৮৪)। *মহাভারতম্*, শ্রীমৎহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যেণ অনূদিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলিকাতা

মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় [সম্পা ও অনূ], (১৪১৬)। *মনুসংহিতা*, দ্বিতীয় সংস্করণ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা

মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় [সম্পা ও অনূ], (২০১১)। *কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্* (১ম ও ২য় খণ্ড), দ্বিতীয় সংস্করণ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা

যোগীরাজ বসু, (১৯৭৫)। *বেদের পরিচয়*, দ্বিতীয় সংস্করণ, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা

শ্রীজাহ্নবীচরণ ভৌমিক (১৩৮২)। *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস* (বৈদিক ও লৌকিক), সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা

শ্রীবিজনবিহারী গোস্বামী [অনূ ও সম্পা] (১৯৯২)। *অথর্ববেদ*, তৃতীয় সংস্করণ, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা

শ্রী সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী [অনূ ও সম্পা], (২০০৫)। *মহাকবি কালিদাস প্রণীতম্ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্*, ষষ্ঠ সংস্করণ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কোলকাতা

শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ, (১৩৬৬)। *মহাভারতের সমাজ*, দ্বিতীয় প্রকাশ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

শ্রীসুধীরকুমার দাশগুপ্ত (১৯৪১)। *আমাদের পরিচয়*, বীণা লাইব্রেরী, কলিকাতা

ড. ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (১৯৮৮)। *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (১৪১০)। *তপোবন* (শান্তিনিকেতন), রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা

রমেশচন্দ্র দত্ত অনূদিত, (১৯৮৭)। *ঋগ্বেদ-সংহিতা* (প্রথম খণ্ড), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা

রমেশচন্দ্র দত্ত অনূদিত, (১৯৭৬)। *ঋগ্বেদ-সংহিতা* (দ্বিতীয় খণ্ড), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা

শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য, শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ, (১৯৮৪)। *সংস্কৃতানুশীলনে রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা

সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার (দশম খণ্ড ও পঞ্চদশ খণ্ড), নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা

Ramendra Mohan Bose, (1976). *Kālidasa: Abhijñāna- Śakuntalam,* Sixth edition (Reprint), Modern Agency Private Ltd., Calcutta

Saradaranjan Ray, (1966). *Bhavabhūti's Uttaracharitam*, Seventh edition (Revised and enlarged), Calcutta